# কোচবিহারের লোকজীবনে পূজা-পার্বণ ও ব্রত অনুষ্ঠান: প্রথা, বিশ্বাস ও সমন্বয়ের রূপরেখা

**মলয় চক্রবর্তী**

*স্বাধীন গবেষক ও সমাজ-নৃতত্ত্ব বিশ্লেষক*

*ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ*

✉ *chakraborty.malay51@gmail.com*

**সারসংক্ষেপ**

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার লোকজীবনে পূজা-পার্বণ ও ব্রত-অনুষ্ঠান একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, যা মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা, উর্বরতা-কেন্দ্রিক বিশ্বাস এবং আদিম যাদুবিদ্যার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে কোচবিহারের লৌকিক দেবদেবী, পূজা-পার্বণ ও ব্রত-অনুষ্ঠানের একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা করা হয়েছে— *কাতি পূজা, তিস্তাবুড়ি পূজা, হুদুম দ্যাও/দেও ব্রত, ষাইটল ব্রত, সুবচনী ব্রত, কাত্যায়নী ব্রত* প্রভৃতি লোকাচারের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আনুষ্ঠানিকতা এখানে আলোচিত হয়েছে। দেখা যায়, এই ব্রত-পার্বণগুলির অধিকাংশই নারীকেন্দ্রিক, সন্তান কামনা ও পারিবারিক মঙ্গল-সাধনার সঙ্গে যুক্ত, এবং এদের মধ্যে আদিম বৃক্ষপূজা, প্রাণীপূজা ও যাদুবিশ্বাসের ধারা আজও প্রবহমান। পাশাপাশি এই প্রবন্ধে কোচবিহারের হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত লোকাচার এবং ব্রত-ভিত্তিক লোকনৃত্যের সামাজিক তাৎপর্যও বিশ্লেষিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, কোচবিহারের এই লোকায়ত পূজা-পার্বণ কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও সামাজিক সংহতির বাহক, যা উত্তরবঙ্গের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে আজও প্রাণবন্ত রাখে।

**সূচক শব্দ:** *কোচবিহার, লোকসংস্কৃতি, ব্রত-পার্বণ, রাজবংশী সমাজ, লোকদেবতা, উর্বরতা-বিশ্বাস, লোকনৃত্য, সমন্বয়ী সংস্কৃতি*

## ১. ভূমিকা

উত্তরবঙ্গের একটি প্রান্তিক অথচ সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ জনপদ কোচবিহার। এখানকার জনজীবনে আজও লোকধর্ম ও লোকাচার এক গভীর ও জীবন্ত শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্মের পাশাপাশি এখানে গড়ে উঠেছে এক সমান্তরাল লোকায়ত ধর্মজগৎ, যার কেন্দ্রে রয়েছে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী এবং তাঁদের ঘিরে

পালিত নানা পূজা-পার্বণ ও ব্রত-অনুষ্ঠান। এই লোকাচারগুলি মূলত কৃষিনির্ভর রাজবংশী সমাজের জীবনযাত্রা, ঋতুচক্র এবং পারিবারিক-সামাজিক প্রয়োজন থেকে জন্ম নিয়েছে সেইসঙ্গে বংশপরম্পরায় মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে এসেছে। কোচবিহারের গ্রামীণ জনপদে ঘুরে ঘুরে সংগৃহীত ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক তথ্য ও স্থানীয় জনশ্রুতির ভিত্তিতে এই প্রবন্ধে লৌকিক দেবদেবী, পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান ও ব্রত-ভিত্তিক লোকনৃত্যের একটি বিশ্লেষণাত্মক রূপরেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই— কোচবিহারের এই বিপুল লোকায়ত সম্পদকে নথিবদ্ধ করা এবং তার অন্তর্নিহিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুসন্ধান করা, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যের একটি সুসংহত চিত্র পৌঁছে দেওয়া যায়।

## ২. গবেষণা পদ্ধতি ও উপাত্ত সংগ্রহের প্রকৃতি

লোকসংস্কৃতির অধ্যয়ন কোনো একরৈখিক বা শুধুমাত্র গ্রন্থনির্ভর কাজ নয়; এর জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রসমীক্ষা, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, এবং গ্রামীণ অনুষ্ঠান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা। কোচবিহারের বিভিন্ন মহকুমা— বিশেষত তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ এলাকার গ্রামগুলিতে বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত এই ধরনের পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক তথ্যের সমন্বয়েই এই প্রবন্ধের বিশ্লেষণ গড়ে উঠেছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে *গিদাল-গিদালী, মূলানী* (গীতগায়িকা) ও পুরোহিত শ্রেণির মানুষজনের বয়ানকে, কারণ এঁরাই মূলত এই ব্রত-পার্বণের জীবন্ত ধারক ও বাহক। পাশাপাশি রাজবংশী সমাজবিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশিত গবেষণাকর্মের সঙ্গে এই ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্যকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে বিশ্লেষণটি কেবল ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি বৃহত্তর অ্যাকাডেমিক প্রেক্ষাপটেও দাঁড় করানো যায়। এই আন্তঃবিভাগীয় পদ্ধতি যেখানে নৃতত্ত্ব, লোকসাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে কোচবিহারের লোকায়ত ধর্মজগতের একটি অপেক্ষাকৃত সামগ্রিক চিত্র নির্মাণে সহায়ক হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায়।

## ৩. কোচবিহারের ব্রত-পার্বণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

কোচবিহারের লোকাচারগুলি লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানকার অধিকাংশ ব্রত-পার্বণ শাস্ত্রীয় পৌরাণিক দেবদেবীকেন্দ্রিক নয়, বরং লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এই দেবদেবীদের অনেকেরই কোনো নির্দিষ্ট মূর্তিরূপ নেই; কোথাও ঘট, কোথাও শোলার প্রতীক, আবার কোথাও শুধুমাত্র মাটির ঢিবি বা গাছের ডালকেই দেবতা

রূপে কল্পনা করে পূজা করা হয়। এই ব্রতগুলির অন্তরালে সাধারণত তিন ধরনের প্রধান প্রেষণা কাজ করে— ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা পূরণ (যেমন *কাত্যায়নী ব্রতের মতো কুমারী ব্রত*), পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি ও সন্তান-মঙ্গল কামনা, এবং প্রকৃতির অশুভ শক্তি বা দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ব্রত-পার্বণের প্রায় প্রতিটির নেতৃত্বে থাকেন নারী— বিশেষত প্রবীণা সধবা বা বিধবা রমণী, যাঁদের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় *মূলানী বা গিদালী*। এঁদের নেতৃত্বেই গীত, নৃত্য ও ব্রতকথার মাধ্যমে অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়। আরও একটি লক্ষণীয় দিক হল, এই ব্রতগুলির অধিকাংশেরই কোনো নির্দিষ্ট তিথি-পঞ্জিকা-নির্ভরতা নেই; বরং সপ্তাহের নির্দিষ্ট বার (যেমন সোম বা বুধবার) অথবা ঋতু-সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে এগুলি পালিত হয়, যা এই আচারগুলির আদিম কৃষিভিত্তিক উৎসের ইঙ্গিত বহন করে। এই ব্রতগুলির উপকরণেও একটি সাধারণ প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায় যেমন *কলাগাছের ফাঁটা, শোলার ফুল-পাখি, ধান-দূর্বা, পান-সুপারি ও চাল-হলুদের* ব্যবহার প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ফিরে ফিরে আসে, যা এই লোকাচারগুলির অভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যাকরণের ইঙ্গিত দেয়। এই সমস্ত ব্রতের আরেকটি অভিন্ন উপাদান হল ব্রতকথা— পূজার শেষে বা মাঝপথে বলা এক ধরনের মৌখিক আখ্যান, যার মধ্য দিয়ে দেবতার উৎপত্তি, মাহাত্ম্য এবং ব্রত-পালনের সুফল বর্ণিত হয়। এই ব্রতকথাগুলি লিখিত রূপে সংরক্ষিত নয়; বরং মূলানী বা গিদালীর কণ্ঠে মৌখিকভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাহিত হয়ে আসছে, ফলে এতে আঞ্চলিক ভাষারীতি, স্থানীয় ভাষা-উপভাষা ও কথ্যরীতির একটি স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে। ব্রতকথা শোনার সময় ব্রতিনীরা প্রায়শই হাতে সুপারি বা ধান-দূর্বার ছড়া নিয়ে বসেন, যা এই আখ্যান-শ্রবণকে একটি আধা-আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য দান করে। এইভাবে গীত, নৃত্য ও কথকতার এক ত্রিবিধ সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কোচবিহারের প্রতিটি ব্রত-অনুষ্ঠান, যা একে নিছক পূজার আচার থেকে একটি সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় রূপান্তরিত করে।

## ৪. লৌকিক দেবদেবীর জগৎ

কোচবিহারের পূজা-পার্বণ বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হয় এখানকার লৌকিক দেবদেবীর বিচিত্র জগৎ। গ্রামের রক্ষক দেবতা হিসেবে সর্বাধিক পূজিত মাসান— যাঁর *মুড়িয়া, জলুয়া, শুকান, বাড়িকা, জখা, হাতি, গড়কাটা, ঘোড়া* প্রভৃতি ২৪ রকমের আঞ্চলিক রূপভেদ প্রচলিত। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই মাসানের একটি নির্দিষ্ট থান থাকে, যেখানে নিয়মিত পূজা-অর্চনা চলে। এর পাশাপাশি শিব এখানে *বুড়া ঠাকুর, মহাকাল, ডাংধরা বা গাবুরদেব* নামে লৌকিক

রূপে পূজিত হন। সন্তানের অসুখ-বিসুখ নিরাময়ের দেবতা যখা-যখি, বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষাকারী দেবতা বাঘসুর ও সোনারায়, এবং কালী ঠাকুরাণীর একাধিক লৌকিক রূপ— *মূর্তিহীন কালী, মাধাই খালের কালী, মনস্কামনা কালী, মাসান কালী*— এই তালিকাকে আরও বিস্তৃত করে। সর্প দেবী মনসা এখানে *বিষহরি, পদ্মা বা ষাইটল বিষহরি* নামে পূজিত হন, এবং তাঁকে নিয়ে প্রচলিত পালাগানে লখীন্দর-বেহুলার কাহিনি নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। এছাড়া *থানসিঁড়ি, বারভাই বাইশ্যাল, শীতলা বা বুড়িমা, সাত বইনী (সপ্তমাতৃকা), সুঙ্গাই ও ভাণ্ডানী* দেবীর মতো একাধিক স্থানীয় দেবদেবীও কোচবিহারের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হন। এই লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে অনেকেই আবার নির্দিষ্ট পেশা বা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত— যেমন বারুজীবী সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা *সুঙ্গাই*, অথবা বিভিন্ন কারিগর ও কৃষিজীবী শ্রেণির নিজস্ব পৃষ্ঠপোষক লোকদেবতা। এই পেশাভিত্তিক দেবতা-কল্পনা প্রমাণ করে যে, কোচবিহারের লোকধর্ম কেবল একটি সমসত্ত্ব বিশ্বাস-কাঠামো নয়, বরং তা বিভিন্ন পেশাজীবী ও সামাজিক স্তরের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন থেকে ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠা এক বহুস্তরীয় সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব *গেরাম ঠাকুর* বা গ্রামদেবতা থাকা এবং সেই দেবতার নামে গোটা গ্রামের সম্মিলিত পরিচয় গড়ে ওঠার রীতিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা লোকদেবতাকে গ্রামীণ সামাজিক সংগঠনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। কোচবিহারের লোকধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এখানকার হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত দেবতাশ্রেণি। তোর্ষা নদীর তীরে পূজিত *তোর্ষা পীর*, নৌকাডুবির হাত থেকে রক্ষা পেতে পুজিত হন *খোয়াজ পীর*, পাঁচালীর মাধ্যমে স্মরণীয় *সত্যপীর*, এবং স্থানীয় দরগাকেন্দ্রিক *পাগলা পীর, শাহগরীব কামাল ও শাহপীরের* মতো লোকদেবতারা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই সমানভাবে পূজনীয়। এই সমন্বয়ী ধারা কোচবিহারের লোকধর্মকে এক বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য দান করে, যা দশম অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

## ৫. বৃক্ষপূজা ও দেবস্থানের ঐতিহ্য

কোচবিহারের লোকধর্মে বৃক্ষপূজার একটি সুপ্রাচীন ও সজীব ধারা লক্ষণীয়। *শালেশ্বরী বা শাল শিড়ি* নামে পরিচিত শালগাছের পূজা, জিগাগাছের সঙ্গে প্রতীকী সই পাতানোর প্রথা, এবং *বট-পাকুড়ের বিয়া* নামক অনুষ্ঠান— যেখানে দুটি বৃক্ষকে বিবাহ-অনুষ্ঠানের অনুকরণে পূজা করা হয়— এই ধারারই বিভিন্ন রূপ। প্রজনন ও উর্বরতা কামনায় পালিত *বাঁশ পূজা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা মূলত *মদনকাম বা কামদেবকে* কেন্দ্র করে চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী

তিথিতে স্থানীয় রাজবংশী যুবকরা পালন করেন। এই ব্রতটি জেলার অন্যতম পুরুষ-কেন্দ্রিক ব্রত, যেখানে ব্রতীরা কয়েকদিন নিরামিষ আহার ও সংযমী জীবনযাপনের পর বাঁশগাছকে পূজা করেন।

এর পাশাপাশি কোচবিহারে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দেবদেউল, দরগা, থান ও পাট— যেমন *মদনমোহন মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বানেশ্বর শিবমন্দির, বড়দেবী মন্দির, সিদ্ধনাথ শিবমন্দির ও কামতেশ্বরী* দেবীর মন্দির। এই দেবস্থানগুলি কেবল পূজার স্থান নয়, বরং গ্রামীণ সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও কাজ করে, যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মেলা, উৎসব ও সামাজিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

## ৬. ঋতুভিত্তিক ও কৃষিকেন্দ্রিক পূজা-পার্বণ

কোচবিহারের অনেক পূজা-পার্বণ সরাসরি কৃষিচক্রের সঙ্গে সংযুক্ত। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে পালিত *কাতি বা কার্তিক পূজা* এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফসল কাটার পূর্বমুহূর্তে অনুষ্ঠিত এই পূজায় রাজবংশী রমণীরা বংশবৃদ্ধি ও শস্যবৃদ্ধি উভয়েরই কামনা করেন। এই পূজার সঙ্গে যুক্ত কাতি নাচ জেলার অন্যতম জনপ্রিয় ধর্মীয় নৃত্যানুষ্ঠান, যেখানে গিদালীর দল সারারাত ধরে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে ব্রতকথা পরিবেশন করেন। একইভাবে পৌষ সংক্রান্তিতে পালিত পুষনা পার্বণে গৃহপালিত পশু, বিশেষত গরু-বাছুরের পূজা করা হয়, যা কৃষিজীবী সমাজে পশুসম্পদের গুরুত্বকেই প্রতিফলিত করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে পালিত *বিষুয়া বা বিষুমা* পার্বণে স্নান, বিশেষ খাদ্য গ্রহণ এবং শিকার ও মৎস্য আহরণের প্রথাগত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে বছরান্তে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নবীকরণের এক প্রতীকী তাৎপর্য নিহিত। আশ্বিন সংক্রান্তিতে পালিত *ক্ষেতিলক্ষ্মী* পূজা ফসলের সমৃদ্ধি কামনায় অনুষ্ঠিত হয়, এবং বিজয়া দশমীর পরে *হলকর্ষণ বা হাল পাইত্রা* অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কৃষিমরসুমের সূচনা উদযাপিত হয়।

এছাড়া তিস্তা নদীর তীরবর্তী জনজীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ *তিস্তাবুড়ি পূজা,* যেখানে নদীর করুণাময়ী রূপকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয় এবং মেছেনী খেলার নাচের মাধ্যমে নদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। পূজার সমাপ্তিতে *ছত্রধারী দেওতাকে* ঘিরে নদীর হাঁটুজলে সমবেতভাবে নাচ হয়, যা এই অনুষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। বৃষ্টির দেবতাকে ঘিরে পালিত *হুদুম দ্যাও/দেও* ব্রত এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনাবৃষ্টি বা খরার সময় কৃষিজীবী রমণীরা এই ব্রত পালন করেন, যেখানে গভীর রাতে নির্জন স্থানে কলাগাছ ও বাঁশগাছ পুঁতে দেবতার প্রতীকী রূপ কল্পনা করা হয় এবং নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বৃষ্টির প্রার্থনা জানানো হয়। এই ধরনের অনুষ্ঠানে বিশ্ব-লোকসংস্কৃতিতে

পরিচিত আদিম বৃষ্টি-আহ্বান আচারের ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়, যা তুলনামূলক লোকসংস্কৃতি চর্চায় সুপরিচিত অনুকরণমূলক যাদুবিদ্যার (sympathetic magic) তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। কৃষিকেন্দ্রিক এই পূজা-পার্বণগুলি একদিকে যেমন ধর্মীয় আচার, তেমনি অন্যদিকে কৃষিজীবী সমাজের সমষ্টিগত উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষার এক সাংস্কৃতিক প্রকাশও বটে।

## ৭. নারীকেন্দ্রিক ব্রত অনুষ্ঠান: সন্তান-কামনা ও পারিবারিক মঙ্গল

কোচবিহারের ব্রত-অনুষ্ঠানের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে নারীকেন্দ্রিক ব্রত, যেগুলির মূল উদ্দেশ্য সন্তান-কামনা এবং পারিবারিক মঙ্গল-সাধনা। এর মধ্যে সাইটোল বা ষাইটল ব্রত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা পৌষ-মাঘ মাসে নিঃসন্তান রাজবংশী রমণীরা সন্তান কামনায় পালন করেন। এই ব্রতে মূল ব্রতী নারীর পাশাপাশি *বৈরাতী* নামে পরিচিত সহায়িকারা থাকেন এবং গিদালীর দল সাইটোল দেবীর পূজা-গীত পরিবেশন করেন, যেখানে মাটির ঘট, বটের ডাল বা কাঁঠাল গাছের ডাল দিয়ে দেবীমূর্তি কল্পনা করা হয়। একইভাবে *সুবচনী ব্রত* সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কেন্দ্র করে প্রতি সোম ও বুধবারে পালিত হয়, যেখানে দেবীর বাহন হাঁসের প্রতীক হিসেবে হাঁসের ডিম নিবেদন করার রীতি লক্ষণীয়। এই দেবীকে হংসবাহিনী দুর্গা বা চণ্ডীর একটি লৌকিক রূপ বলেই স্থানীয়ভাবে বিবেচনা করা হয়।

*কাত্যায়নী ব্রত* কোচবিহারের প্রচলিত ব্রতগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে বিবেচিত, কারণ এই ব্রতকথায় শিব-পার্বতীর পূজা ও বিবাহের কাহিনি জড়িয়ে আছে, এবং কোচবিহার রাজ্যের সৃষ্টিকথায় একে *"শিবভূমি"* বলে উল্লেখ করা হয়। রাসপূর্ণিমায় পালিত এই ব্রতে সাত বছর বয়সী কন্যারা ভবিষ্যতে ভালো স্বামী লাভের আশায় অংশ নেন, ফলে একে কুমারী ব্রতও বলা হয়; এই ব্রত একবার শুরু করলে তিন বা পাঁচ বছর ধরে টানা পালন করতে হয়। এই একই ধারায় ষষ্ঠী বা ষাট ব্রত সন্তান-পালনের দেবী ষষ্ঠীকে কেন্দ্র করে জ্যৈষ্ঠ মাসে পালিত হয়, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত সন্তানের মঙ্গল-চিন্তায় জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হয়, এবং নিরাকলি ব্রত সম্পূর্ণ নারী-কেন্দ্রিক আচার হিসেবে স্বামী, পুত্র-কন্যা ও সংসারের মঙ্গল কামনায় পালিত হয়। তুলসী ব্রত চৈত্র সংক্রান্তির দিন তুলসীমঞ্চে জল ঢেলে পালন করা হয়, যাতে গ্রীষ্মের দাবদাহে তুলসীগাছ শুকিয়ে না যায়— এখানেও দেখা যায় প্রকৃতি-সংরক্ষণের একটি লৌকিক নীতি ধর্মীয় আচারের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এছাড়া *গার্সী ব্রত, নাটাইচণ্ডী ব্রত, নিয়মসেবা ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত ও*

*অথাই-পথাই ব্রতের* মতো আরও একাধিক আচার পারিবারিক দীর্ঘায়ু, সুস্থতা ও নিরাপত্তার কামনায় পালিত হয়। এই ব্রতগুলির অন্তর্নিহিত সুর অভিন্ন— নারীর সামাজিক ভূমিকা মূলত সন্তানধারণ ও পারিবারিক কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে যে ঐতিহ্যবাহী ধারণা, তারই এক গভীর প্রতিফলন ঘটে এই লোকাচারগুলিতে।

আরও একটি লক্ষণীয় ব্রত হল *কুলো নামানো ব্রত,* যা ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে খরা বা অনাবৃষ্টির সময় কৃষক পরিবারের রমণীরা প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে মুক্তি পেতে পালন করেন। গানই এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ, এবং লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কুলো নামালে বৃষ্টি হয়। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচি তিথিতে পালিত *আমাতি ব্রত* মূলত বিধবা রমণীরা পালন করেন, যার উদ্দেশ্য অধিক ফসল-কামনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা।

## ৮. আদিম যাদুবিদ্যা, প্রতীক-ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক স্তরবিন্যাস

কোচবিহারের ব্রত-পার্বণগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে আদিম যাদুবিশ্বাস ও বৃক্ষপূজার ধারা সুস্পষ্টভাবে বহমান। প্রায় প্রতিটি ব্রতে কলাগাছ, বাঁশগাছ, বটের ডাল বা কাঁঠাল গাছের ডালকে দেবতার প্রতীকী আধার হিসেবে ব্যবহার করার রীতি লক্ষণীয়, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃক্ষপূজার একটি ধারাবাহিকতা বলেই মনে করা যায়। এর পাশাপাশি লক্ষণীয় প্রাণী-প্রতীকের ব্যবহার— *ষাইটল দেবীর বাহন ময়ূর, সুবচনীর বাহন হাঁস, ষষ্ঠীর বাহন বেড়াল* ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন লোকদেবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাহন-কল্পনায় প্রাগৈতিহাসিক টোটেম ও কুলপ্রতীক-চিন্তার একটি সম্ভাব্য প্রভাব অনুমান করা যায়। দেবদেবীর কল্পনার এই স্তরবিন্যাস আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রা থেকে ক্রমে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান লৌকিক রূপে পৌঁছেছে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *হুদুম দ্যাও* ব্রতের গোপনীয় ও রাত্রিকালীন প্রকৃতি, যেখানে শুধুমাত্র নারীরাই মধ্যরাতে গোপনে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই ধরনের গোপনীয়তা ও রাত্রিকালীন অনুষ্ঠান-রীতি বিশ্বজুড়ে প্রচলিত বৃষ্টি-আহ্বানকারী উর্বরতা-আচারের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে তুলনামূলক লোকসংস্কৃতি চর্চায় বহুবার চিহ্নিত হয়েছে। এই তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি কোচবিহারের স্থানীয় লোকাচারকে বৃহত্তর নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে সাহায্য করে এবং প্রমাণ করে যে, এই আচারগুলি নিছক স্থানীয় কুসংস্কার নয়, বরং মানবসভ্যতার আদিম বিশ্বাস-কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত এক সর্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ। কোচবিহারের ব্রত-পার্বণগুলিকে তাই দুই ভাগে ভাগ করা যায়— একদিকে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য পালিত ব্রত (যেমন কাত্যায়নীর মতো কুমারী ব্রত),

অন্যদিকে পারিবারিক বা সামাজিক মঙ্গল-সমৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে পালিত ব্রত। এই দ্বিবিধ শ্রেণিবিভাগ কোচবিহারের লোকায়ত নারী-ব্রতগুলির উদ্দেশ্যগত বৈচিত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলে।

## ৯. ব্রত-ভিত্তিক লোকনৃত্য: আচার থেকে পরিবেশনায়

কোচবিহারের ব্রত-পার্বণের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল লোকনৃত্য। এই নৃত্যগুলিকে মোটামুটি চারটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়— ধর্মীয় অনুষঙ্গে পালিত নৃত্য (যেমন *ষাইটল, কাতি, সুবচনী, হুদুম দেও ও বিষহরি* পূজার নাচ), সামাজিক অনুষঙ্গে পালিত নৃত্য (যেমন মহরমের *লাঠিখেলার নাচ, গম্ভীরা খেলার নাচ, সং-এর নাচ, ভাঁড়াভাঁড়ি নাচ*), যুদ্ধ বা সমর-নৃত্য (বিশেষত রাভা আদিবাসী সম্প্রদায়ের *হাঙ্গারমানী, হাঙ্গাইপানি, হাপাড়ি, নাক চেংরেনি* জাতীয় নৃত্য) এবং লোকনাটকের নৃত্য (*কুষাণ পালা, চোর-চুন্নির পালা, কালীকাচ নাচ*)। এই শ্রেণিবিভাজন থেকেই স্পষ্ট হয় যে, কোচবিহারের লোকনৃত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং তা ধর্মীয় আচার, সামাজিক উৎসব এবং কাহিনি-বর্ণনার এক সমন্বিত পরিবেশনা-রূপ।

লক্ষণীয় বিষয় হল, অনেক ব্রত-নৃত্যে লিঙ্গভিত্তিক কঠোর বিধিনিষেধ প্রচলিত। যেমন বাঁশপূজার নাচ ও মহরমের লাঠিখেলার নাচে সম্পূর্ণভাবে পুরুষদেরই অংশগ্রহণের অধিকার, আবার হুদুম দেও নাচ ও ষাইটল-কাতি পূজার নাচে কেবল নারীদেরই অংশগ্রহণের অধিকার। যেসব নৃত্যে ঐতিহ্যগতভাবে কেবল পুরুষরাই অংশ নেন, সেখানে অনেক সময় নারী-চরিত্রেও পুরুষরাই অভিনয় করেন, যা স্থানীয়ভাবে "চরিত্রাভিনয়" নামে পরিচিত। কালীকাচ নাচের মতো অনুষ্ঠানে দেখা যায়, একজন নৃত্যশিল্পী একই পরিবেশনার মধ্যে ক্রমান্বয়ে দুর্গা, কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি একাধিক দেবীরূপ ধারণ করেন, যা লোকনৃত্যশৈলীর আঙ্গিক-সমৃদ্ধি ও পরিবেশনাগত দক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। *ধান ভাঙা ও বৈরাতি নাচের* মতো অনুষ্ঠানে গ্রামীণ কৃষিজীবনের দৃশ্যকল্প নৃত্য-অভিনয়ের মাধ্যমে পুনর্নির্মিত হয়, আর মেছেনী খেলার নাচে তিস্তাবুড়ি পূজার সমাপ্তি-উৎসবে যুবতী মেয়েরা রঙিন পতাকা হাতে নদীর জলে বৃত্তাকারে নেচে ওঠেন। এই নৃত্যগুলির অধিকাংশই পেশাদার শিল্পীদের দ্বারা নয়, বরং সাধারণ গ্রামীণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয়, যা এদের লোকজীবনের সঙ্গে গভীর সংশ্লিষ্টতাকেই প্রমাণ করে।

বিষহরি বা মনসা পূজার নাচেও লোকনাটকীয় উপাদান স্পষ্ট— এখানে গিদালীর দল লখীন্দর, বেহুলা, চাঁদ সদাগর প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করে পালাগানের মাধ্যমে সর্পদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, এবং এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক

গৃহস্থকে *মারেয়া* নামে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে রাভা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমর-নৃত্যগুলিতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও কৃষিকর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট— হালকর্ষণের সময় পরিবেশিত *হাপাড়ি নাচ,* নববর্ষ উপলক্ষে পরিবেশিত বছর *পিদান নৃত্য,* এবং মাছ ধরার সময় পরিবেশিত *নাক চেংরেনি নৃত্য* কৃষি ও জীবিকার সঙ্গে নৃত্যকলার নিবিড় সম্পর্ককেই তুলে ধরে। এই সম্প্রদায়ের নৃত্যে সঙ্গীতের চেয়ে অঙ্গসঞ্চালন ও পদক্ষেপণের ভূমিকাই বেশি, যা একে অন্যান্য রাজবংশী লোকনৃত্য থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। লোকনাটকের ধারায় কুষাণ পালা একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, যেখানে রামায়ণ-কাহিনি ও লোকবিশ্বাস-নির্ভর নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে সংলাপ, সঙ্গীত ও দেহজ অভিনয়ের এক সমন্বিত পরিবেশনা গড়ে ওঠে। কালীকাচ নাচে দেখা যায় দশভুজা সিংহবাহিনী দুর্গার আবির্ভাব থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী রূপে রূপান্তরের এক নাটকীয় পরিবেশনা, যেখানে অসুর নিধনের দৃশ্য দর্শক-শ্রোতাদের এক গভীর নৈতিক তৃপ্তি দান করে। উল্লেখ্য, এই নৃত্যগুলির অনেকটাই আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে, যা কোচবিহারের অমূল্য লোকনৃত্য-ঐতিহ্যের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করে তোলে।

## ১০. হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ও সামাজিক সংহতি

কোচবিহারের লোকধর্মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ধর্মী চরিত্র। এখানকার বহু লোকদেবতা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই সমানভাবে পূজনীয়— যেমন *সত্যপীর, পাগলাপীর, তোর্ষাপীর ও খোয়াজপীর*। এই দেবতাদের থান বা পাটে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মানুষ প্রার্থনা জানাতে যান, এবং অনেক ক্ষেত্রে একই লোকাচারে, যেমন বেড়া ভাসানো প্রথায়, উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এই সমন্বয়ী ঐতিহ্য প্রমাণ করে যে, কোচবিহারের রাজবংশী সমাজ কোনো এক সময়েই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; বরং লোকধর্মের স্তরে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এক গভীর মিলন ঘটেছে।

এছাড়া এই পূজা-পার্বণ ও ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি গ্রামীণ সমাজে সামাজিক সংহতি সৃষ্টিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। নদীর ভাঙন, মহামারী, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সমগ্র গ্রামবাসী একযোগে লোকদেবতার আশীর্বাদ কামনা করেন, যা সমষ্টিগত মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তাবোধ তৈরি করে। কোচবিহারের গ্রামীণ লোকদেবতারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়, বরং সমগ্র গ্রামের সম্মিলিত মঙ্গল-কামনার প্রতীক, এবং এই কারণেই এই লোকাচারগুলি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক সংহতির এক অনন্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এমনকি জেলার শিক্ষিত

ও শহুরে মানুষজনও অনেক ক্ষেত্রে এই লোকদেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন, যা প্রমাণ করে যে লোকধর্ম কেবল প্রান্তিক বা নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা কোচবিহারের সামগ্রিক সামাজিক পরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

## ১১. আঞ্চলিক বৈচিত্র্য: মহকুমাভিত্তিক পার্থক্য

কোচবিহার জেলার বিভিন্ন মহকুমায় এই পূজা-পার্বণ ও ব্রত-অনুষ্ঠানের রূপ ও তীব্রতায় লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়, যা এই জেলার আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেই তুলে ধরে। তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ি, মাথাভাঙা ও চিলাখানা অঞ্চলে ষাইটল, সুবচনী ও কাতি পূজার প্রচলন তুলনামূলকভাবে বেশি প্রাচীন ও অক্ষুণ্ণ, যেখানে গিদালী ও মূলানীদের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ধারা আজও বহমান। অন্যদিকে মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি মহকুমায় তিস্তা ও তোর্ষা নদীর নৈকট্যের কারণে *তিস্তাবুড়ি পূজা, মেছেনী খেলার নাচ* এবং নদীকেন্দ্রিক লোকাচারের প্রাধান্য বেশি লক্ষণীয়। হলদিবাড়ি ব্লকের কাশিয়াবাড়ি ও দিনহাটা ২ ব্লকের বামনহাটের মতো গ্রামগুলিতে *ভান্ডাভাণ্ডি নাচ ও মহরমের লাঠিখেলার নাচের* মতো সামাজিক নৃত্যানুষ্ঠানের চর্চা তুলনামূলকভাবে বেশি সজীব। দিনহাটা মহকুমার কিসমতদশ ও গোঁসানিমারী অঞ্চলে *সুবচনী ও কাতি নাচের* বিশেষ রীতি প্রচলিত, যেখানে স্থানীয় গিদালী পরিবারগুলি বংশপরম্পরায় এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এই আঞ্চলিক পার্থক্যের পেছনে কাজ করে নদীব্যবস্থা, জনগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য (রাজবংশী, রাভা, মেচ, মুসলিম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আনুপাতিক উপস্থিতি) এবং ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থী জনগোষ্ঠীর অভিপ্রয়াণজনিত সাংস্কৃতিক মিশ্রণ। ফলে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতিকে কোনো একরৈখিক বা সমসত্ত্ব কাঠামো হিসেবে দেখা উচিত নয়; বরং একে বহু ধারার আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক মোজাইক হিসেবেই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

## ১২. উপসংহার

কোচবিহারের এই লোকায়ত পূজা-পার্বণের বাস্তবিক তাৎপর্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নদীভাঙন, বন্যা, অনাবৃষ্টি বা মহামারীর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নাগাল যেখানে সীমিত ছিল, সেখানে এই লোকাচারগুলি একটি সমষ্টিগত মানসিক সহায়তা-ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করত। হুদুম দেও ব্রতের মাধ্যমে বৃষ্টির প্রার্থনা, কুলো নামানো ব্রতের মাধ্যমে অনাবৃষ্টি-নিরাময়ের প্রয়াস, কিংবা তিস্তাবুড়ি পূজার মাধ্যমে নদীর করুণা

প্রার্থনা— এই সমস্ত আচারের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন, যা দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজকে একত্র রাখতে সাহায্য করত। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হলেও, এই লোকাচারগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি বরং সামাজিক সংহতি, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সমষ্টিগত স্মৃতির বাহক হিসেবে এগুলি আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই দ্বৈত তাৎপর্য— একদিকে আধ্যাত্মিক-মনস্তাত্ত্বিক, অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, কোচবিহারের ব্রত-পার্বণকে নিছক অতীতচারী সংস্কার হিসেবে দেখার পরিবর্তে একটি জীবন্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুধাবন করার দাবি রাখে।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, কোচবিহারের পূজা-পার্বণ ও ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি নিছক ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। এই লোকাচারগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে কৃষিজীবী রাজবংশী সমাজের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, নারীর সামাজিক ভূমিকা, আদিম যাদুবিশ্বাসের ধারাবাহিকতা এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির গভীর সমন্বয়। শিক্ষা ও নগরায়ণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্যবাহী ব্রত-পার্বণগুলির অনেকগুলিই আজ বিলুপ্তির পথে— কাত্যায়নী ব্রত, নাটাইচণ্ডী ব্রত বা কালীকাচ নাচের মতো আচারগুলির প্রচলন ক্রমশ কমে আসছে বলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় বারবার উঠে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে কোচবিহারের এই লোকজ ঐতিহ্যকে নথিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এগুলি কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, বরং উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সহায়ক হবে, এবং এই ধারার নিরবচ্ছিন্ন চর্চাই পারে আগামী প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যের প্রাণশক্তি পৌঁছে দিতে।_

## তথ্যসূত্র

1. রায়, ডঃ গিরিজাশঙ্কর। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ। গবেষণা গ্রন্থ, ১৯৭২।

2. আহমেদ, ওয়াকিল। বাংলার লোকসংস্কৃতি। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।

3. বসাক, ডঃ শীলা। বাংলার ব্রত পার্বণ। ১৪০৫ (বঙ্গাব্দ)।

4. Hunter, W. W. A Statistical Account of Bengal. Vol. X, Reprint, 1974.

5. Frazer, J. G. The Golden Bough. 1967.